জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২১

সৈয়দ শামসুল হকের গল্প : নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বরূপ অন্বেষণ

শিল্পী খানম[*]

Abstract

Syed Shamsul Haque is a modern, life-oriantal writer. He is a versatile genius. He enriched all branches of literature with his creativity and aestheticism.Syed Shamsul Haque is the best among the writers who devotedly enhanced Dhaka oriented literature after the partition of 1947. In his 1950- 60 stories he depicated the dreams, struggle and failures of the post-partition, emerging, urbaniged middle class people of Dhaka city. There was a Renaissance among the educated middle class of EastBengal based on the language movment of 1952 during post partition various complexities of the military region during Pakistani colonization make the middle class people extremely angrished. Syed Haque's early writings thematically embrace the existential crisis of the middle class. Instead of developing his story's background on rural life, Syed Haque, being inspired by contemporareity and modernity, choose urban middle class life as his contest. His stories focus on urban predicament, immorality, politics and realities of socio-familial life.

ভূমিকা

দেশ বিভাগোত্তর সৈয়দ শামসুল হকই (১৯৩৫ – ২০১৬) প্রথম পঞ্চাশের দশকে নতুন উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বভাব, স্বপ্ন, সংগ্রাম ও রাজনৈতিক জাগরণ তাঁর গল্পে শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন। বিভাগ পরবর্তী লেখকগণ যেখানে নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবন থেকে গল্পের ঘটনা, উপকরণ ও চরিত্র নির্মাণ করেছেন, সেখানে সৈয়দ হক বিকাশমান নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনবলয়কে বেছে নিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের উত্তালতরঙ্গ মধ্যবিত্ত বাঙালির মননে, সৃজনে ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে তোলে। এ সময়ে বাঙালি জাতিসত্তার ক্রমজাগরণ ঘটে, তারা অধিকার সচেতন হয় ও স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম শুরু করে। বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার নাগরিক জীবন নব্যপুঁজিপতি ও বুর্জোয়াতন্ত্রের আগ্রাসনে বিপর্যস্ত হয়। এ ছাড়া পাকিস্তানের সামরিক শাসনের অন্তঃসারশূন্যতা নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। ফলে জাগরণ ঘটে শিক্ষিত, গণমানবিকচেতনার মধ্যবিত্তের; যাদের হাত ধরে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালিরা তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়। সৈয়দ হকের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, তিনি বিশেষ একটি সময়পর্বের অর্থাৎ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের নাগরিক মধ্যবিত্তের জাগরণ ও সঙ্কট গল্পের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত করেছেন। তাঁর রচিত *তাস* (১৯৫৪), *শীত বিকেল* (১৯৫৯), *রক্ত গোলাপ* (১৯৬৪), *আনন্দের মৃত্যু* (১৯৬৭) –এই চারটি গল্পগ্রন্থ সমসাময়িক নাগরিক মধ্যবিত্তের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-পারিবারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কনে বিশিষ্টতার দাবীদার। তাঁর এ পর্বের গল্পে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নাগরিক মধ্যবিত্তের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন। তিনি মধ্যবিত্ত জীবনকে বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

ইংরেজ শাসনামলে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলো নষ্ট হলে মানুষ শহরমুখী হতে শুরু করে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে নগরায়ণ ঘটতে থাকে। শহরকে ঘিরে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

---

[*] সহযোগী অধ্যাপক. বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শহর এলাকায় একদিকে সৃষ্ট হয়েছে পুঁজিপতি, শিল্পপতি, ছোট-বড় ব্যবসায়ী, শ্রমিক শ্রেণি এবং অপরদিকে চাকুরিজীবী। নতুন শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোতেও মৌলিক রূপান্তর ঘটে। ব্রিটিশ আমলে কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বাঙালি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের জাগরণ ঘটলেও মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশে ছিল ধীর গতি এবং তা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাপকতা লাভ করে। 'হিন্দু সমাজের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলমান সমাজেও ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই প্রবল রূপ ধারণ করে।'[১] বিংশ শতাব্দীর রাজনীতির অঙ্গনে ধীরে ধীরে মুসলমানদের পদচারণা ঘটতে থাকে। এরপর ইংরেজবিরোধী নানা আন্দোলন সংগ্রামে মুসলিম জনগোষ্ঠী হিন্দুদের পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। '১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে পূর্ববাংলার মুসলমানরা ঘরের কাছাকাছি উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করে।'[২] এরপর ক্রমান্বয়ে জনমানসে জন্ম নেয় রাজনীতি সচেতনতা। সংবেদনশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চেতনায় রাজনৈতিক অধিকার বিশেষ স্থান দখল করে। বিভাগোত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটে। শিক্ষাগ্রহণ ও জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে দুচোখে সুখ-স্বপ্ন এঁকে মধ্যবিত্ত শহরে পাড়ি জমায়। গ্রাম থেকে আগত সাধারণ মানুষের শহরকে ঘিরে থাকে নানাস্বপ্ন, কিন্তু এই সব মানুষ শহরে এসে কঠিন ও জটিল বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির সংগ্রামে তারা অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হয়। সৈয়দ হক উদীয়মান সেই মধ্যবিত্তকে গল্পের কেন্দ্রানুগ বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তিনি গল্পের বিষয় নির্বাচনে বৈচিত্র্যমুখী। 'সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের কবিতা, নাটক,গল্পও উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে সমকালের সামাজিক,রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটের কথকতা।'[৩] তাঁর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের গল্পে নব উত্থিত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির কঠিন জীবনবাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে। উক্ত সময়খণ্ডে প্রকাশিত গল্পসমূহকে বিষয়বস্তুর আলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বরূপ আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন :

ক. নাগরিক মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চেতনার গল্প – 'রাত্রি', 'সম্রাট'
খ. নাগরিক মধ্যবিত্তের আর্থিক সংকটের গল্প – 'তাস', 'শীত বিকেল', 'সিঁড়ি' ও 'হিজলকাঠের নাও'
গ. নাগরিক মধ্যবিত্তের বেকারসমস্যা নিয়ে রচনা করেন–'নাম'
ঘ. নাগরিক মধ্যবিত্তের দাম্পত্য সংকটের গল্প –'রোকেয়ার মুখ'
ঙ. নাগরিক মধ্যবিত্তের অবক্ষয়, বিকার নিয়ে রচিত গল্পের নাম –'আনন্দের মৃত্যু'
চ. নাগরিক মধ্যবিত্তের ভ্রষ্টাচার নিয়ে রচিত হয়েছে –'পরাজয়ের পর' ও 'যদি জানতে চান'
ছ. গ্রামীণ মধ্যবিত্তের সৃজনশীলতা ও প্রতিবাদী চেতনার গল্প– 'কবি'

(ক) নাগরিক মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ঘিরে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অসাম্প্রদায়িক শক্তি যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয়। ফলে জনমানসে ক্রমশ প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়। নব্যশিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় ধর্মকেন্দ্রিক সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী ভাবনার রাজনীতির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এসময় তারা মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের মাধ্যমে বুর্জোয়া মানবতাবাদী ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মার্কসবাদী জীবনদর্শন ও সাহিত্য-শিল্পভাবনার অনুশীলনচক্র গড়ে ওঠে।'[৪] পঞ্চাশের দশকে স্বাধিকারপ্রত্যাশী বাঙালিদের অসম সমাজে মধ্যবিত্তের শক্তিশালী জাগরণ সৈয়দ শামসুল হকের 'রাত্রি' গল্পে একটি বিশিষ্ট মাত্রা লাভ করেছে।

লেখক গল্পে সময়কে ধারণ করেছেন, সময়ের জীবনকে শিল্পের ক্যানভাসে এঁকেছেন। এসময় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিরা অধিকার আদায়ে এগিয়ে আসে এবং তারা রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। 'রাত্রি' গল্পে পঞ্চাশের দশকে এই অধিকার সচেতন শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। গল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনৈতিক কর্মী আসাদ রাজনৈতিক গ্রেফতার ও নির্যাতন এড়াতে সরলদিঘি গ্রামে এক স্কুল শিক্ষকের বাড়িতে গোপনে আশ্রয় নেয়। তাদের দলের নেতাকর্মী ছাড়া পরিবারের কেউই জানত না তার আত্মগোপনের ঠিকানা। তার বড় ভাই ও বড় বুবু – এঁরা আত্মস্বার্থমগ্ন,তাদের আদর্শ চেতনার বিপরীত মতের সর্মথক আসাদ। সে কমিউনিস্ট ভাবধারার রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী, আর তার পরিবার বুর্জোয়া পাকিস্তানপন্থী মধ্যবিত্ত। 'কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সচেতন শিক্ষিত মানসে আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।'[৫] গল্পের আসাদ সেই মধ্যবিত্ত সমাজের গণমানবিক শ্রেণির প্রতিনিধি, সে কোন ব্যক্তিস্বার্থে নয়, দেশের মানুষের অধিকার আদায়ে রাজনীতির আদর্শ লালন করে। সাহসী আসাদ নির্যাতন, কারাভোগকে ভয় পায় না। 'সৈয়দ শামসুল হকের 'রাত্রি' গল্পে বিধৃত রয়েছে মধ্যবিত্তের সমাজবদলের রাজনীতি-সম্পৃক্তির কথা। 'রাত্রি' গল্পে আসাদ রাজনৈতিক দলের কর্মী। বৈষম্যপীড়িত সমাজ পরিবর্তনের আদর্শে অনুপ্রাণিত।'[৬]

'রাত্রি' গল্পের আসাদ হুলিয়া মাথায় নিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে অজ্ঞাত ঠিকানায় আশ্রয় নেয়। তার মিয়াভাই তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ছুটে যান। তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন : 'আমাকে কথা দাও আমি নিজে ওদের লিখে দেব।' কিন্তু পূর্ববাংলার জনগণের অধিকার আদায়ে অনড় আসাদ সেই বন্ড লিখে দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে : 'না মিয়া ভাই তা হয় না।' স্পষ্টভাষী আসাদ ফেরারি হয়ে দূরদর্শী কর্মকৌশল অবলম্বন করে বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনা করেছে। বড়ভাই যখন তাকে বলেছে, তাহলে পালিয়ে বেড়াও কেন? রাজনীতি কর, বুক ফুলিয়ে সামনে দাঁড়াও না কেন? এর উত্তরে আসাদ বলেছে: 'কাকে পালিয়ে বেড়ান বলছেন আপনি? মিছিমিছি শক্তির অপচয় যারা করে, তারা মূর্খ।' গল্পে বাঙালিদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দ্রোহীচেতনা যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমনি তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত বড় মিয়ার কণ্ঠেফুটে উঠেছে :

> তোমাদের কথাগুলো বেশ মিষ্টি আসাদ। কিন্তু কাজের বেলা? আটচল্লিশ সনের কথা ছেড়েই দাও, বায়ান্ন সন, এমন কি এই চুয়ান্নর কথাই ধর। কতটুকু কি করতে পারলে? একটা চালে তোমাদের সবগুলো চাল ভেস্তে দিল। এখনো ভেবে দেখ।[৭]

বড় মিয়া ভাই চলে যাবার পর সরলদিঘিতে আসাদের কাছে ছুটে আসে তার মেজবু। গল্পে রাজনীতির ক্ষেত্রে একজন পরোক্ষ নারী কর্মীর সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় তাহলো মেজবুবু। আসাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে মেজবু তাকে সহযোগিতা করেছে, প্রেরণা দিয়েছে । এ প্রসঙ্গে আসাদের ভাষ্য:

> এমন কত রাত গেছে, চুপি চুপি ঘরে এসে মেজবু সারারাত তার সঙ্গে বসে পোস্টার লিখে দিয়েছেন। কতবার লিফলেটের খসড়া পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিয়েছে সেলাইয়ের বড় খাতার আড়ালে।

সরলদিঘিতে মেজবু আসাদের কাছে এসে তাকে অন্যত্র আত্মগোপনে যাবার নির্দেশ দেন। বড়ভাই তাকে ফিরিয়ে নিতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা করেছে। আসাদকে ধরিয়ে দিতে তার গোপন

ঠিকানা পুলিশকে দিয়েছে। এ গোপন খবর জানতে পেরে মেজবু সরলদিঘিতে ছুটে আসে। কেননা তিনিই একমাত্র জানেন যে, আসাদ একরোখা ও সাহসী। কোন অত্যাচার নির্যাতনের সে পরোয়া করে না। আসাদ নির্ভীক, সে জেল জুলুমকে ভয় পায় না। তার রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাবার অবিচল সত্তার পরিচয় একদা মেজবু পেয়েছিল : 'না ভয় আমার নেই।' আসাদের বড় মিয়া ভাই দোদুল্যমান চরিত্র, কিন্তু আসাদ পূর্ববাংলার নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতীকী চরিত্র। 'রাত্রি' গল্পে মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> 'রাত্রি' গল্পে আসাদ চরিত্রের রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে পূর্ববাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অন্বেষার শিল্পকথা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-নিপীড়ন উপেক্ষা করে পঞ্চাশের দশকে পূর্ববাংলার স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা প্রত্যাশী বাঙালিরা যে সামূহিক আন্দোলন শুরু করেছিল আসাদ হচ্ছে তারই প্রতিনিধি।[৮]

সৈয়দ শামসুল হকের 'সম্রাট' গল্পেও শহরকেন্দ্রিক নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছাত্র সমাজের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ছবি ফুটে উঠেছে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন জারি করলে ছাত্র সমাজ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কেননা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তিনি ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল, সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ও মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত ঘোষণা করেন এবং বহু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতাকে এসময় কারারুদ্ধ করা হয়। গল্পের কাহিনিতে লক্ষ করা যায়, জহির সাহেব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ছয় বছর পূর্বে রেলের চাকায় বাম পা কাটা পড়ার পর থেকে তিনি ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে স্থবির জীবন-যাপন করেন। এক সময় কঠোর অনুশাসনে সন্তানদের তিনি লালন-পালন করেছেন। বাইশ বছর বয়সী তরুণ শাহেদকে নিয়ে তিনি আশঙ্কায় থাকেন, ছেলের গতিবিধি তার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া পুত্রকে তিনি সবসময় রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে সতর্ক করেন। হঠাৎ একদিন জহির সাহেব দৈনিক পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ধর্মঘটের খবরে চিন্তিত হয়ে পড়েন:

> অত্র হইতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত। সোজা হয়ে বসেছেন তিনি। চোখ দুটো মিটমিট করে বারেক। কালে কালে ছেলেগুলোর হলো কি? কথায় কথায় ধর্মঘট, মিছিল। অবাক হন তিনি! কই, এরকম তো তাঁরা ছিলেন না। কয়েকটা বখাটে ছেলে মিলে গোটা দেশটাকে যেন উচ্ছন্নে ঠেলে দিচ্ছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল যে মধ্যবিত্ত, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি জহির সাহেব। বিভাগ-পূর্ব ক্রমবিকশিত মুসলিম মধ্যবিত্তের সমকালীন জীবনাকাঙ্ক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। বিভাগপূর্ব মধ্যবিত্ত ছিল অসংঘটিত, তারা একটি শ্রেণিচরিত্রে পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবার পূর্বেই ভারত বিভাগ হয়। তবে এই শ্রেণি শাসকগোষ্ঠীর প্রতি প্রবল অনুগত,স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে উল্লসিত। জহির সাহেবের মতো মধ্যবিত্তের স্বরূপ অনুসন্ধানে গবেষকের মন্তব্য স্মরণীয় : 'অসম বিকশিত সমাজের শ্রেণি-অস্তিত্বের অসংঘটিত অবস্থা এবং দ্বন্দ্বময় ও রক্তাক্ত অভিজ্ঞতাপুঞ্জ পাকিস্তান আন্দোলনের তীব্রতায় যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে, তেমনি তা বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার আকর্ষণে অভিভূতও হয়েছে।'[৯] তাদের সেই মোহময় পাকিস্তানে বৈষম্য নিরসনে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পরবর্তী প্রজন্ম লিপ্ত হয়। কয়েক বছরের ব্যবধানে নব্যউত্থিত মধ্যবিত্ত তার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ে রাজপথ বেছে নেয়। পাকিস্তান শাসনামলে বাঙালিরা জাতিগত শোষণ-নিপীড়নের থেকে মুক্তি পেতে লড়াই করে, যার শৈল্পিক রূপায়ণ 'সম্রাট' গল্প।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শাহেদ সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। বুর্জোয়া মূল্যবোধ লালিত পিতা নিজ পুত্রের রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা পছন্দ করেন না। তাইতো ক্ষুব্ধকণ্ঠে তিনি পুত্রকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেন:

> কিসের ধর্মঘট তোমাদের ? শাহেদ চুপ করে থাকে। আশা করি, তুমি এর মধ্যে নেই। আমি চাই না, তুমি ওসব বেল্লিকদের দলে গিয়ে ভেড়। জীবনে কোনদিন বাপের সামনা-সামনি মিছে কথা বলেনি শাহেদ। কিন্তু আজ বলল, না। না, নেই তারপর আর দাঁড়াল না, তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল নিচে।

এখানে পিতা ও পুত্রের মতাদর্শগত বিরোধ লক্ষ করা যায়। পিতা পুরাতন মধ্যবিত্তের আর পুত্র শাহেদ নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। নতুন ও পুরাতন মধ্যবিত্তের আদর্শগত সংঘাতে সূচিত হয়েছে পুরাতনের পরাজয়ে নতুনের বিজয়। পিতার আদেশ অমান্য করে শাহেদ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। সাহসী শাহেদ তখনই পিতার সামনেই বেরিয়ে পড়ে। সে ছাত্র ধর্মঘটে বাড়িতে বসে থাকতে পারে না। কলেজ জীবন থেকে রাজনীতিতে যুক্ত শাহেদ পিতার রক্তচক্ষু অমান্য করে রাজপথে অধিকার আদায়ে মিছিলের অগ্রভাগে শামিল হয়:

> একটু পরেই মিছিলটা স্পষ্ট চোখে পড়ে তাঁর। এতক্ষণ যা হাজার হাজার শরীরের একটা স্রোত ছিল, এখন তা যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মুখগুলো আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ... প্রথম চারজনের ভেতরেই খুঁজে পান শাহেদকে।

জহির সাহেব ক্ষুব্ধ নয়নে মিছিল পর্যবেক্ষণ করেন। সমুদ্র তরঙ্গের মতো সেই মিছিলে বিস্ফোরিত কণ্ঠে নির্ভীক শাহেদের বলিষ্ঠতা এভাবেই পিতার সম্মুখে উন্মোচিত হয়:

> কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল। শাহেদের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। বাম হাতে ঘাম মুছতে পেছনে দিকে একবার ফিরে তাকায়। তারপর শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে শ্লোগান দেয়। আগুন ধরিয়ে দেয় যেন সেই উচ্চারণ সমস্ত মিছিলে। একটি শব্দের বিস্ফোরণ যেন দশদিকে কাঁপিয়ে তোলে।

জহির সাহেব হঠাৎ গভীর সংকটে পড়েন। গল্পে তার মানসিক সংকটে ছবি ফুটে উঠেছে। মিছিলে পুত্রকে দেখার পর স্ত্রীকে ডেকে বলেছেন: 'শাহেদকে দেখেছ? আমি ওকে খুন করে ফেলব। বেইমান ডাকাত।' 'জহির সাহেবের আত্মিক সংকটই গল্পের মূল বিষয়বস্তু।'[১০] মিছিলের অগ্রভাগে থাকা শাহেদের খোঁজে পরদিনই বাড়িতে পুলিশের আগমন। পুলিশের বড় দারোগা বাড়ি সার্চ করতে চাইলে তিনি সম্মতি দিলেন। শাহেদকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায় আর নিশ্চুপ থাকেন পিতা। আধিপত্যবাদী জহির সাহেব বিদ্রোহী পুত্রের কাছে পরাভূত হয়েছেন। আইয়ুব খানের শাসনামলে গণবিরোধী প্রশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ফুঁসে ওঠে। ফলে প্রশাসন দমন-পীড়নের পথ বেছে নেয়। ষাটের দশকে বাঙালিদের মুক্তির পথ সূচিত হয়। গল্পের সমাপ্তিতে জহির সাহেবের ক্রাচচ্যুত হয়ে মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া প্রতীকী ব্যঞ্জনামণ্ডিত। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-সমাজের বিজয় সূচিত হবে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের পর ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উদার প্রগতিশীল চেতনার মধ্যবিত্ত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়। সামরিক শাসনামলে বাঙালিদের অধিকার আদায়ে ছাত্র সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> সামরিক আইন প্রবর্তন, প্রকাশ্য রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা, গণতন্ত্রের অবয়বে স্বৈরাচারী এক নায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বাঙালি জনগোষ্ঠীর সংগ্রামশীল চেতনাস্রোতকে সাময়িকভাবে স্তব্ধ করতে সক্ষম হলেও জাতিসত্তার গভীরে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও দ্রোহ ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হতে থাকে। আইউবি দশকের এই নব প্রেক্ষাপট ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, জাতিগত শোষণ-নিপীড়ন এবং গণবিরোধী শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে জাতীয় চেতনা পুনরুজ্জীবনে ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।[১১]

(খ) নাগরিক মধ্যবিত্তের আর্থিক-সংকটের চিত্র

সৈয়দ শামসুল হকের ‘তাস’ গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক সংকটের চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পের ঘটনাংশ বেশির ভাগ বিধবা মায়ের মনোজগৎ ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। একমাত্র পুত্র খোকনের চাকরি সূত্রে গ্রাম থেকে শহরে তাদের আগমন। গল্পে প্রয়াত স্বামীর স্মৃতি বিজড়িত একটি পুরাতন দেয়াল ঘড়িকে কেন্দ্র করে মায়ের মনস্তাত্ত্বিক সংকট তুলে ধরা হয়েছে। ‘তাস’ সৈয়দ শামসুল হকের শিল্পসৃষ্টির এক অনবদ্য নির্দশন। এতে একটি নারীর মাতৃত্ব ও নারীত্বের চাওয়া-পাওয়াকে সমান্তরাল রেখায় যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তাতে মনস্তত্ত্বের জটিল বিষয়ে লেখকের সূক্ষ্ম অনুভব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।’[১২] বিধবা মায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারের সুখ দুঃখের, অভাব-অনটনের চিত্র গল্পে ফুটে উঠেছে। খোকনের বেতনের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ছয় জন। চার বোন সালেহা, বুলু, টুনু ও বেবি। এর মধ্যে বড় বোন সালেহা বিধবা। ‘তাস’ গল্পের শুরুতে আর্থিক দৈন্যদশার চিত্র ফুঠে উঠেছে তাদের অল্পভাড়ার স্বল্প পরিসর বাসার বর্ণনায় :

> দু খানা দশ হাত বারো হাত কামরার সামনে এক চিলতে বারান্দা আর বিশ্রী রকমের ছোট এক দরোজা এক জানালা দিয়ে রান্নাঘর। রান্নাঘর বলতে ওই, ভাঁড়ার বলতেও ওই। শোবার ঘর দুটো তাই তৈজসপত্র এটা সেটায় এত গাদাগাদি যে নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গাটুকু খালি নেই।

অধিক ভাই-বোনসমেত খোকনের মধ্যবিত্ত পরিবার শহরে কোনো রকম টিকে আছে। মাসিক খরচের খাতায় বাড়ি ভাড়া, তিন বোনের স্কুলের বেতন পরিশোধের পর মায়ের হাতে সংসার খরচের জন্য সামান্য থাকে দশখানা দশ টাকার নোট। আর্থিক অনটনের কারণে বিধবা বোন সালেহার জন্য একখানা চুলপেড়ে ধূতিকাপড় কিনতে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়।খোকা অফিস থেকে রিকশা করে বাড়ি ফিরলে মা চিন্তিত হয়ে পড়েন অপ্রয়োজনীয় খরচের ভয়ে। বাড়ির দেয়ালে থাকা পুরাতন ঘড়িটা নষ্ট হলে খোকা তা যথাসময়ে মেরামতের ব্যবস্থা করে না। স্বামীর স্মৃতি বিজড়িত ঘড়িটার প্রতি মায়ের আবেগ ও ভালোবাসা পুত্রের কাছে অজানা ছিল। একদিন সে বাড়িতে নতুন এক প্যাকেট তাস কিনে আনে এবংবন্ধুদের নিয়ে তাস খেলে আনন্দে মেতে ওঠে। নিঃসঙ্গ মায়ের নির্ঘুম রাত্রে মনোগহনে খোকন, তাস আর দেয়ালের ঘড়িটা ঘুরপাক খায়। লেখক গল্পে মায়ের জটিল মনস্তত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন :

> সময় বয়ে যাচ্ছে- যাচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত। চোখ বুঁজে মা স্পষ্ট দেখতে পেলেন স্বামী শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ খুলে তাঁকে হারাতে চান না। তাই তিনি চোখ বুঁজেই রইলেন নিঃসাড় হয়ে। এক সময়ে স্বামীর মুখখানা অস্পষ্ট হয়ে এল। তারপরে তিনি তাঁর সেই দগ্ধ আবেগ সামলাতে না পেরে দু-হাতে বিছানার চাদর আঁকড়ে ধরলেন শক্ত মুঠিতে।

নিস্তব্ধ রাতে মা ভীষণ আক্রোশ নিয়ে ঘুমন্ত খোকনের তাসের প্যাকেটটা ছিঁড়ে ফেলার জন্য হাতে তুলে নেন। কিন্তু পরক্ষণেই ছেলের মুখখানা দেখে তার মধ্যে গভীর মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে। খোকনের তাস গোপনে ছিঁড়ে ফেলতে সিদ্ধান্ত নিয়েও তা করতে পারেননি : 'খোকনের মুখখানা কি সুন্দর আর কেমন মিঠে। মা দেখেন আর দেখেন। ছোটবেলার সেই কচি আদলটুকু এখনও ওর মুখ থেকে উঠে যায়নি।' গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের আনন্দ ও বিষণ্ণতার অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে। '*তাস* গ্রন্থের নাম গল্পে অবলম্বিত হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবার-জীবনের ফ্রেম। বাড়ির একটি পুরানো দেয়াল ঘড়িকে কেন্দ্র করে বিধবা মায়ের যে আবেগ ও স্মৃতি, এক কাতর বিষণ্ন আবহে মায়ের সেই মনোবাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।'[১৩]

সৈয়দ শামসুল হক 'শীত বিকেল' গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। গল্প কথক আনুর জবানিতে তার পরিবারের স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা ও অপূর্ণতার বেদনার পটভূমিতে নির্মিত গল্পটি মধ্যবিত্তের আর্থিক সংকটের চিত্র। আনুরা মহকুমা সদরে সরকারি কোয়ার্টারে বসবাস করে। সরকারি কর্মকর্তা থানার দারোগা পিতার সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা ও আদর্শের স্নেহছায়ায় তারা বেড়ে ওঠে। তার পিতা যা মাইনে পান তা দিয়ে বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ চলে সাধারণভাবে। আর্থিক চাপে পিষ্ট পরিবারটিতে বিবাহযোগ্য কন্যা চারজন। আনুর বড় বোন সালু আপা অধিক বয়সেও পাত্রস্থ হয়নি। উপযুক্ত কিংবা যোগ্য পাত্রের কাছে কন্যাকে সম্প্রদান করতে যে অনেক টাকার প্রয়োজন। প্রিয় বড় আপা প্রসঙ্গে আনুর অন্তরের হাহাকার এভাবেই ফুটে উঠেছে:

> শুনেছি, আমি যখন কোলে তখন নাকি বড় আপার ইস্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেছে। তারপর কত জায়গা থেকে বড় আপার বিয়ে আসছে, কিন্তু কোনটাই বাবার পছন্দ হয়নি। মনের মতো কাউকেই তিনি খুঁজে পাননি। তার আজ অবধি বিয়ে হয়নি তার।

'শীত বিকেল' গল্পে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতার দুর্বিষহ জীবন যন্ত্রণার ছবি ভেসে উঠেছে, যা সমকালীন সমাজব্যবস্থার চিত্রকেই মনে করিয়ে দেয়। আনুর মা স্বামীকে কন্যাদের পাত্রস্থ করার জন্য তাগাদা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। অধিক বয়স পর্যন্ত কন্যাদের উপর্যুক্ত পাত্রের কাছে বিয়ে দিতে পারছেন না বিধায় সমাজের মানুষের নানান কটূক্তি শুনতে হয়। আনুর মা তাইতো ক্ষুব্ধ হয়ে স্বামীকে বলেছেন মনোবেদনার কথা:

> বিয়ে যদি আটকে নাই থাকে, তবে এক বছর কি চোখে দেখনি? তারপর বুঝি মা কেঁদেই ফেললেন তুমি তো আর বাসায় থাক না। দিনরাত্তির পাড়া পড়শীর কথা শুনতে যে কেমন লাগে, তা তুমি বুঝবে কি করে?

এখানে মধ্যবিত্তের কঠিন ও নির্মম বাস্তবতা অঙ্কিত হয়েছে। আনুর পরিবারে স্বপ্ন ছিলো তার বড় ভাই পানুকে নিয়ে। অনেক প্রতীক্ষার পর পানুর বেকারত্বের অবসান হয়। সে ঢাকায় রেলওয়েতে সহকারী স্টেশন মাস্টার পদে চাকুরিতে নিযুক্তির খবর জানালে পরিবারের সবাই আনন্দিত হয়। আনুর পরিবারে প্রথম স্বপ্নভঙ্গের ঘটনাটি ঘটে বড় ভাই পানুর আকস্মিক রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। পুত্রের অকাল বিয়োগ-ব্যথায় পিতা-মাতা গভীরভাবে শোকাহত হন।আনুর পরিবার যে আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপ্ন দেখেছিল সেটা অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যায়। বিপর্যস্ত পিতা আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন আনুকে ঘিরে। এই শহরে ভালো স্কুল নেই তাই আনুকে তার বাবা বড় শহরে ভালো লেখাপড়া শেখবার জন্য বোর্ডিং-এ থাকার ব্যবস্থা করতে চায় :'তুমিও লেখাপড়া শিখে

বড় চাকুরি করবে। অনেক মাইনের।’ মধ্যবিত্তের সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই। আনুর পরিবারে সর্বশেষ বিপর্যয়ের খবর তার বাবার ঘুষ গ্রহণের দায়ে কারাবন্দী হয়েছেন। মাত্র চার হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সৎ, নীতিবান পুলিশ অফিসার নৈতিকতা বিসর্জন দিলেন। সারা শহরে ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের উপার্জনক্ষম পিতার শাস্তি হলে অসহায় পরিবার সরকারি কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে ভাড়া বাসায় চলে যায়। আনুর বাবার এই নৈতিক স্খলন মূলত আনুর বোর্ডি-এ লেখাপড়ার খরচ যোগাবার জন্য। কারাবন্দি পিতা অপূর্ণ স্বপ্নের কথা বলেছেন আনুকে:

> তুমি আমার একমাত্র ছেলে। তোমাকে নিয়ে আমার কত আসা, কত ভারসা। একটু থামলেন তিনি, ভালো করে লেখাপড়া করবে। লেখাপড়া শেষ হলে কত বড় চাকুরি করবে। কিছুরই অভাব, কিছুরই ভাবনা থাকবে না তোমার, তুমি মন দিয়ে পড়াশুনা করো।

‘শীত বিকেল’ গল্প আনুর পরিবারের উত্থান-পতনের কাহিনি। মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার পটভূমিকায় রচিত হলেও গল্পের শেষে আনুর সংবেদনশীল চৈতন্য বিপর্যয় অতিক্রম করে ইতিবাচকতায় উত্তীর্ণ হয় যা ভবিষ্যৎ আশাবাদিতার ইঙ্গিতবহ: ‘দু’একটা করে নতুন পাতা ধরছে। আরো ধরবে। একদিন কচি সবুজ পাতা গাছগুলো ছেয়ে যাবে।’ মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন-সংগ্রাম রূপায়ণে গল্পটি কালোত্তীর্ণ। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> অর্থনৈতিক চাপে ভেঙে পড়া বা সঙ্কুচিত এবং প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সংযোগসাধনে ব্যর্থ সমন্বয়কামী অস্তিত্বসচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জৈবনিক ট্রাজেডি অঙ্কিত হয়েছে ‘শীত বিকেল’ গল্পে। পুলিশ অফিসার পিতার ধর্মবোধ, সন্তান বাৎসল্য ও নীতিনিষ্ঠ জীবন আকস্মিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে মাত্র চার হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণের কারণে। গল্পের উত্তম পুরুষের অনুভব ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে অনাবৃত হয়েছে এই মধ্যবিত্ত পরিবারটির স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, তার দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়েছে পরিবারের অন্তর্ময় বিষণ্নতা ও ব্যর্থতাবোধ।[১৪]

সৈয়দ শামসুল হক রচিত ‘সিঁড়ি’ গল্পে ঢাকা শহরে বসবাসরত মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা জাহানারার জীবনসংগ্রামের দিনলিপি চিত্রায়িত হয়েছে। আর্থিক সংকটে পড়ে তার জীবনের গতিপথপাল্টে যায়। পিতা কঠিন অসুখে আক্রান্ত হলে পরিবারের সংকটে জাহানারা লেখাপড়া বন্ধ করে স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরিতে নিযুক্ত হয়। কেননা পিতার উপার্জন বন্ধ হলে একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদরের লেখাপড়ার দায়িত্বও তার ওপর বর্তায় । অসুস্থ পিতার চিকিৎসায় প্রচুর অর্থ খরচ হলেও তিনি আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেননি: ‘সে কি যমে-মানুষে টানাটানি বাবাকে নিয়ে। শুধু যমে-মানুষেই নয়, জমানো যে-কটা টাকা ছিল তাতেও টান পড়ল।’ দু-কামরার ছোট ঘরে তাদের পরিবারের বসবাস। জাহানারার মাইনের ওপর নির্ভরশীল তাদের পরিবারের ভরণপোষণ। বাবার চিকিৎসার খরচ, ছোটোভাই আসাদের লেখাপড়ার খরচসহ সংসার খরচের সব টাকার ব্যবস্থা করতে তাকে টিউশনিও করতে হয়। প্রথম যে দিন রোজগারের অর্থ মায়ের হাতে তুলে দিয়েছিল, সেদিন কন্যার উপার্জন বলেই আক্ষেপ করে তিনি যা বলেছিলেন তা আজও জাহানারার স্মৃতিতে ভাসে:

> যেদিন সে ইস্কুল থেকে এসে এক মাসের মাইনে আশিটা টাকা গুনে গুনে সব মায়ের হাতে তুলে দিয়েছিল সেদিন মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, দুঃখ করেছিলেন মেয়ের রোজগারের টাকা হাত পেতে নিতে হয়েছিল বলে। জাহানারা কোনো কথা বলেনি, সেখান থেকে সরে এসেছে তার নিজের ঘরে।

জাহানারা পরিবারের প্রয়োজনে পুত্রসন্তানের মতই দায়িত্ব পালন করেছে, সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। অর্থের কারণে মেধাবী জাহানারা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেনি। পরিবারের ঘানি ঠেনে ক্লান্ত আইবুড় জাহানারা একদিন শান্তিনগরে বান্ধবী রেশমির বাসায় গিয়েছিল। রেশমি সাজানো গোছানো সংসারে প্রফেসর স্বামী নিয়ে সুখে আছে। অথচ যে রেশমি তার চেয়ে কখনও পড়াশুনায় ভালো ছিল না, সেই সহপাঠী আজ সুযোগ পেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। কিন্তু মেধাবী জাহানারা আর্থিক টানাপড়নে স্বপ্নের সিঁড়িতে পৌঁছাতে পারেনি। বান্ধবীর সুখ-স্বপ্ন দেখে জাহানারার মনে স্বামী, সন্তান আর সংসারের বাসনা জাগ্রত হয়। বাড়ি ফিরে এসে ছাদে নিঃসঙ্গ বিকেলে তার মনের একান্ত চাওয়া-পাওয়া উপলব্ধি করে ক্ষণিকের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে:

> বড় নিঃসঙ্গ, বড় অসহায় মনে হয়। আর বুকের ভেতরটা যেন শুধু দীর্ঘশ্বাসেই তৈরি। রেশমির কথাগুলো বাজে। এক দিন এমন ছিল যেদিন ওরা দু-জনে ছিল দু-জনের ছায়া সহচরী। আর আজ? আজ সেই রেশমি? ওর স্বামী নিশ্চয়ই ফিরেছে কলেজ থেকে। সোহাগে রঙিন হয়ে উঠেছে এমন সন্ধ্যা।

মূলত গল্পের শেষে জাহানারার নিঃসঙ্গ ও ব্যথিত চিত্তের হাহাকার ফুটে উঠেছে। গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের পরিবর্তে বিবর্ণ জীবনের বাস্তব ছবি অঙ্কিত হয়েছে।নাগরিক মধ্যবিত্তের আর্থিক চাপে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সংযোগ সাধনে ব্যর্থ জীবনের কাহিনি বর্ণনায় গল্পটি জীবনঘনিষ্ঠ।' সৈয়দ শামসুল হকের 'সিঁড়ি' (তাস, ১৯৫৪) গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। জাহানারা তার অসহায় বিপন্ন পরিবার রক্ষায় প্রতিদিন যুদ্ধে লিপ্ত, তার জীবন আর সংগ্রাম, সংগ্রাম আর জীবন এক, অভিন্ন, অবিচ্ছিন্ন।'[১৫]

সৈয়দ শামসুল হকের 'হিজল কাঠের নাও' গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যাকে ধনাঢ্য পরিবারে পাত্রস্থ করার স্বপ্নময়তার কথা রূপায়িত হয়েছে। হামিদা বানু স্বপ্ন দেখেন বিত্তবান পরিবারের পুত্র আখতারের সঙ্গে তার কন্যা শফিনাজের বিয়ে হলে কন্যা রানীর মতো সুখ লাভ করবে। পুত্র রশীদের বন্ধু আখতার শহরের শিক্ষিত ছেলে,তার আছে বাড়ি ও গাড়ি। হামিদা বানু মনে করেন আখতার উপযুক্ত ও যোগ্য পাত্র– 'আখতারের মতো ভালো আর শরীফ ছেলে লাখে মেলে না।' শফিনাজের পরিবারে অর্থের তেমন প্রাচুর্য নেই। ধনাঢ্য পরিবারের পুত্র আখতার যখন প্রথম অন্য বন্ধুদের সঙ্গে রশীদের বাসায় আসত তখন হামিদা বানু কন্যাকে সংকোচে তাদের সামনে আসতে নিষেধ করতেন; 'বড় বড় ঘরে ওসব বড় বড় কায়াদা-কেতা চলে। আমাদের ওসব কেন? না, শফিনাজ চা নিয়ে দিয়ে আসবে না বাইরের ঘরে।' অথচ সেই আখতারের সঙ্গে কন্যা শফিনাজকে বিয়ে দেয়ার স্বপ্ন বুনতে থাকেন। যদিও আখতারকে একবেলা আপ্যায়ন করতে হিমশিম খেতে হয়। আর্থিক অনটনে হামিদা বানু তাই সামান্য সঞ্চয় কয়েক আনা পয়সা দিয়ে পেসতা-বাদাম এনে আখতারের জন্য নাস্তা তৈরির পরিকল্পনা করেন। কন্যাকে আখতারের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার পরিকল্পনায় শুরু হয় স্বপ্নলোকে মায়ের বিচরণ। মনের বাসনা স্বামীকে জানালে তিনিও যেন অনুরূপ ভাবনা ব্যক্ত করেন : 'ছোটবেলায় একজন হাত দেখে বলেছিল শফিনাজ আমার রাজরানী হবে।' কন্যার ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নের আশায় মা বিভোর হন: 'হামিদা বানুর স্বপ্ন, স্বপ্ন নয়, স্বপ্নে চেয়েও বেশি।' 'হিজল কাঠের নাও' গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের দ্বিধা-সংকোচ যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি তাদের মনের অধরা স্বপ্ন-কল্পনার বাস্তব রূপ দানে লেখক ইতিবাচক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন: 'কখনো কখনো দুয়োরাণীর কুঁড়ে ঘরের প্রসাদে আকাশ বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে।'

(গ) নাগরিক মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা

সৈয়দ শামসুল হকের 'নাম' গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যার দুর্বিষহ চিত্র রূপায়িত হয়েছে। কোম্পানির সামান্য বেতনে কোন রকম স্ত্রী,পুত্র নিয়ে টিকে ছিল আশরাফ। কিন্তু হঠাৎ কোম্পানিটি বন্ধ হওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়ে। চাকুরি চলে যাবার পর তার জীবনে নেমে আসে দুঃসহ অর্থকষ্ট। এক বৎসর যাবৎ তার চাকুরি নেই, কিন্তু স্ত্রীকে সে কথা বলতে পারেনি। তার এই দুর্দশায় বাল্যবন্ধু হুরমত আলীই একমাত্র ভরসা। হুরমতের আর্থিক সহায়তা এবং তার সঙ্গে দুটি টিউশনি নিয়ে কোন রকম সংসার খরচ চালিয়ে যায় আশরাফ। তার খুব বেশি আকাঙ্ক্ষাও নেই। বন্ধু হুরমতের অফিসে বসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে একের পর এক চাকুরির আবেদন করে। তার সহানুভূতি ও দয়ার ওপর সে নির্ভরশীল। মধ্যবিত্ত হুরমতের মধ্যে কল্যাণবোধ আছে। তাকে অবলম্বন করেই সে আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে থাকে। সে যেন বন্ধুর ছায়াসঙ্গী হয়ে ওঠে:

> হুরমত আলীকে ঘিরে সে বাঁচতে চায়, তার অস্তিত্বের অবলম্বন খোঁজে। স্বপ্ন দেখার অভ্যেস তার ছেলেবেলা থেকে, প্রায় কোনো রাতই ফাঁকা যায় না। আজকাল হুরমত তার স্বপ্নের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে।

আশরাফ একদিন বিদেশি একটি কোম্পানিতে চাকুরির ইন্টারভিউ দিতে যাবার আগে হুরমতের কোটটা একদিনের জন্য চেয়ে নেয়। কোটটা গায়ে দিয়ে এক ধরনের উষ্ণতা অনুভব করে, যা তাকে রোমাঞ্চিত করে তোলে। কিন্তু চাকুরির অনুসন্ধান করতে করতে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত আশরাফ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় ভুগতে থাকে। আর্থিক পীড়নে বিপর্যস্ত হয়ে অনেকটা মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। নগর জীবনের দুর্বিপাকে পড়া মধ্যবিত্তের জটিল মনস্তত্ত্ব এভাবেই গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন:

> এবারে মাইনে পেয়েই এরকম একটা কোট করতে সে দেবে। এতদিনে যেন সে স্পষ্ট বুঝতে পারে হুরমত আলীর সঙ্গে তার ব্যবধান শীতে সঙ্গে উষ্ণতার। আশরাফের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয় উষ্ণতার জন্যে। ধার করা উষ্ণতায় গা ডুবিয়ে সে স্বপ্নগ্রস্তের মতো পথ চলতে থাকে।

মধ্যবিত্তের অধরা স্বপ্নের জগতে বিচরণকারী আশরাফ নিজেকে হুরমত আলী ভাবতে ভাবতে যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে উপস্থিত হয়, তখন কর্তা ব্যক্তিরা তার নাম জানতে চাইলে হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে 'হুরমত আলী।' নিজের নামের পরিবর্তে অন্যের নাম বলায় তাকে জানিয়ে দেয়: 'আমরা দুঃখিত। এ নামে কোনো ইন্টারভিউ ডাকা হয়নি। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে।' সৈয়দ হক বৃহত্তর জনজীবনের রূপকার। তিনি নাগরিক জীবনের প্রত্যাশা ও অপ্রাপ্তি দিকগুলো তুলে এনেছেন। 'নাগরিক মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, অসঙ্গতি আর নির্বেদ-অঙ্কনেই সৈয়দ শামসুল হকের মনোযোগ সমধিক।'[১৬] 'নাম' গল্পের আশরাফের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নাগরিক জীবনের কঠিন জীবনসংগ্রামকে চিহ্নিত করে। পাকিস্তান ঔপনিবেশিক আমলে পূর্ব বাংলার বেকারত্ব আর হতাশার ছবি গল্পটিকে করেছে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। আশরাফ ষাটের দশকের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। লেখক তার হতাশাগ্রস্ত মনেরজটিলতা উন্মোচনে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। 'মধ্যবিত্ত জীবনের যন্ত্রণা, অসহায়ত্ব, দারিদ্র্যকে লেখক সৈয়দ শামসুল হক সামান্য একটি ঘটনার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। এই গল্পে লেখক জীবনের না পাওয়ার যন্ত্রণাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রস্ফূটিত করেছেন, যা আশরাফের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে উদঘাটন করে।'[১৭]

(ঘ) নাগরিক মধ্যবিত্তের দাম্পত্যসংকট

সৈয়দ শামসুল হকের 'রোকেয়ার মুখ' গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্তের দাম্পত্য-সংকটের চিত্র ফুটে উঠেছে। রোকেয়ার স্বামী হামিদ বেশ ভালো চাকুরি করে, তাদের কোন আর্থিক সমস্যা নেই , কিন্তু রোকেয়ার আছে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। কয়েক মাস আগে বসন্ত ওঠার পর থেকে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। তার সুন্দর মুখশ্রী বসন্তের কারণে ক্ষত হয়ে যায় এবং এই নিয়ে সে বিষণ্ন হয়ে পড়ে। তার ভাবনা যে, তার স্বামী আর তাকে আগের মতো ভালোবাসেনা। মনোবিকলনে রোকেয়া কখনও নিজের কন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয় আবার কখনও বা উপরতলার ফ্ল্যাটে হাসি ও তার স্বামী জয়নুলের হাস্য কোলাহলে বিমর্ষ হয়ে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। রোকেয়া যখন নববিবাহিত ছিল তখন তার স্বামী তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। তার স্মৃতিতে অবশ্য ঢাকা নগরীর প্রাকৃতির সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে:

> আজিমপুর পেরিয়ে রিকশা রমনা মাঠের কাছে গিয়ে পড়ল। দুধারে নাম জানা আর না জানা গাছের সারি। গাছগুলো স্বচ্ছল ডালপালা ছড়িয়ে মাথার ওপরটা ঢেকে ফেলেছে, সবুজ চাঁদোয়ার মতো মনে হচ্ছে।

রোকেয়া অহেতুক দ্বন্দ্বে ভুগছে। সংসারের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে অন্তরের বেদনা নিয়ে মুহ্যমান থাকে। 'বড় বেশি নিজেকে সে ডুবিয়ে রাখে আজকাল ছোট এই সংসারের কাজে।' রোকেয়া মনোজগতে দ্বন্দ্ব-সংশয়ে নিজেই কষ্ট পায়, 'নিঃশব্দ যন্ত্রণায় সে ভুগতে থাকে।' অবশেষে স্বামীর সান্নিধ্যে তার মনের সন্দেহ দূর হয়। নাগরিক মধ্যবিত্তের মনের টানাপড়েন উপস্থাপনে গল্পটি বিশিষ্টতার দাবিদার। এই গল্পেও লেখক রোকেয়ার বর্হিজগত নয়, অন্তরজগতকেই বেশি উন্মোচন করেছেন। এছাড়া গল্পে নগরসংস্কৃতি ও মধ্যবিত্তের জীবনাচরণ ফুটে উঠেছে। যেমন – হামিদের বই পড়া, সিনেমা দেখতে যাওয়া, পার্কে ঘুরে বেড়ানো প্রভৃতি।

(ঙ) নাগরিক মধ্যবিত্তের অবক্ষয়

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের জগতে অন্যতম প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব সৈয়দ শামসুল হক। তিনি সচেতনভাবেই নাগরিক জীবনের আনন্দ- বেদনা, হতাশা, দুঃখবোধ তাঁর গল্পের উপজীব্য বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তাঁর রচিত 'আনন্দের মৃত্যু' গল্পে আধুনিক মানুষের যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনের অন্তর্জগতে নিঃসঙ্গতা, আশ্রয়হীনতার চিত্র ফুটে উঠেছে। নগরজীবনে বিনোদন কেন্দ্র পানশালাকে ঘিরে গল্পে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। পানশালায় আগত তিন ব্যক্তির দুজন হলেন পান ব্যবসায়ী। তারা পশ্চিম পাকিস্তানে পান চালানের লাইসেন্সের মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে পেরে বেশ উৎফুল্ল। মূলত পাকিস্তানিদের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা করে বাঙালিদের ব্যবসা বাণিজ্যে টিকে থাকতে হত। বাঙালিদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে তারা সহজে সুযোগ পেত না। গল্পে দুই পান ব্যবসায়ী তাই লাইসেন্সের মেয়াদ বাড়াতে পেরে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে :

> আজ ওদের মন ছিল বেশ ফুরফুরে। কারণ আজ দুপুরেই ওরা একটা মস্ত বড় কাজ করেছে; পাকিস্তানে পান চালানের লাইসেন্সটা বাগিয়ে নিতে পেরেছে। ওরা তখন হাসতে থাকে। একে আরেকজনকে বলতে থাকে – দ্যাখো, এই এক চমৎকার ব্যাপার । পান জন্মাই আমরা, পান খেতে জানে ওরা। আল্লা তার বান্দার রুজির জন্যে কি তাজা ব্যবস্থাই না করে রেখেছেন।

এরা দুজন নিয়মিত সন্ধ্যার পর এই পানশালায় এসে তাদের নির্ধারিত টেবিলে বসে মদ্যপান করে আনন্দ পায়। এসময় অজ্ঞাত তৃতীয় আরেক ব্যক্তি প্রাত্যহিক মদ্যপ অবস্থায় মাতাল হয়ে টলতে

থাকে। তারা মাতাল ঐ ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করে। নেশাগ্রস্ত লোকটির বাড়ি ফিরে যাবার সময় টাল খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নেয়ার ভঙ্গিটা তারা উপভোগ করে। দুই মাতালের মধ্যে কল্যাণবোধ নেই। এ প্রসঙ্গে গল্পে উল্লেখ করা হয়:

> লোকটার গেলাশ যখন শেষ হয়, তখন থেকেই ওরা স্থির চোখে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়- এই উঠল, এই উঠবে। কিন্তু উঠেনা। ... ওরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে নির্বাক হয়ে চোখে চোখে তাকে অনুসরণ করে। লোকটা টাল খেতে খেতে নিজেকে সামলে নিয়ে সরল রেখায় চলতে শুরু করলেই ওরা হা হা করে হেসে ওঠে।

পানশালায় হঠাৎ একদিন আর্ত চিৎকার আর বেয়ারাদের ছোটাছুটি লক্ষ করে দুই বন্ধু জানতে পারে মদ্যপ লোকটি তার নির্ধারিত টেবিলেই মরে পড়ে আছে। এ ঘটনায় তারা স্তব্ধ হয়ে যায়, কেননা তাদের আনন্দের মৃত্যু ঘটে। ভোগবাদী জীবন বাস্তবতায় আধুনিক মানুষের নির্মম পরিণতি রূপায়ণে গল্পের বিষয়বস্তু সমকালস্পর্শী। 'জটিল যান্ত্রিক সময়ের অভিঘাতে ভঙ্গুর আধুনিক মানুষের অনিশ্চিত অস্তিত্বের রূপায়ণে এ গল্প বিশিষ্ট।'[১৮] পৃথিবী নামক রঙ্গালয় থেকে আনন্দ উপভোগে নিমজ্জিত মানুষের অন্তিম পরিণতি প্রসঙ্গে গল্পে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গল্পের শেষে মাতাল লোকটির শেষ ঠিকানা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :'বাড়ি যাবে না। অ্যাম্বুলেন্স আসে। লোকটা স্ট্রেচারে শুয়ে লাশ কাটা ঘরে যায়।' সৈয়দ হক গল্পে মধ্যবিত্ত মানসের বিচিত্র প্রবণতা তুলে এনেছেন। পাকিস্তান শাসনামলে পরিবর্তিত নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনের অসারতার দিকটি গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। অসম সমাজবিকাশের ফলে দ্রুত প্রাচুর্যের মালিক হয়ে মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রকৃত অর্থেই জীবনবাস্তবতার অবক্ষয়িত সময়ের প্রতিভূ। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> আপাতভাবে মনে হতে পারে এই গল্প কয়েকজন মাতালের প্রাত্যহিক খুটিনাটি খুনসুটির গল্প, তবে সত্যিকার অর্থে এই গল্পে পঞ্চাশ দশকে নব-উত্থিত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের গূঢ় বাস্তব-জীবন অঙ্কিত হয়েছে। লেখক গভীরভাবে উপযুক্ত পরিবেশ, চরিত্রের ভেতরের খোলস তুলে এনেছেন। মাতাল ব্যবসায়ী দুজনের প্রতিদিনের ক্রিয়াকর্ম গুরুত্বহীন অথচ কি গভীরভাবে তারা তা উপভোগ করে।[১৮]

(চ) নাগরিক মধ্যবিত্তের ভ্রষ্টাচার

সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'পরাজয়ের পর' গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্তের অবক্ষয়, ভ্রষ্টাচার প্রভৃতি শিল্পরূপ লাভ করেছে। গল্পের কথক লোকটি ছিল মাতাল। সে তার গল্পের শ্রোতা জনৈক লোককে ভাইজান সম্বোধন করে গল্পটা বর্ণনা করেছেন। ঘটনা বর্ণনায় জানা যায়, প্রেসিডেন্ট হাউসের ফুটপাতে গাছের তলায় সে দুই যুবককে মারামারি করতে দেখে এগিয়ে যায়। রাস্তায় বহুলোক জড় হলেও কেউ এগিয়ে এসে এদের নিবৃত্ত করে না। একজন যুবকের পরনে সাদা জামা আরেকজন নীলজামা পরিহিত। সাদা জামার হাতে প্রচুর মার খেয়েছে নীলজামা। একারণে কথক নীলজামার পক্ষ অবলম্বন করে আঘাত করে সাদা জামাকে। নিজের পেশীশক্তির বাহাদুরির গল্প এভাবে লোকটিকে শুনিয়েছে:

> এক হ্যাঁচকা টানে কলার ধরে তুলে আনলাম সাদা জামাকে। এর জন্যে তৈরি ছিল না সে। হ্যাঙ্গার থেকে জামা তুলে আনলে হাতে যেমন ঝুলে থাকে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল সাদা জামা। মনে হলো সাতজন্ম থেকে ও আমার হাতে ঝুলে আছে।

রাস্তায় দুই যুবকের মধ্যে তুমুল মারামারির পেছনে ঘটনা হচ্ছে সাদা জামার কলেজ পড়ুয়া বোনকে নিজের গাড়িতে ডেকে নীলজামা শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করে। মেয়েটি অবশ্য ভাইয়ের বন্ধু ভেবে

কাছে এগিয়ে যায়। বোনের মর্যাদাহানীতে সাদা জামা নীল জামার ওপর চড়াও হয়। আর এসময় গল্পের কথক নীল জামাকে রক্ষা করে। মূলত সত্য ঘটনা জানার পর তার মধ্যে এক ধরনের অপরাধবোধ কাজ করে, সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে:

সাদা জামার বোনকে নিয়ে কেলেংকারী করতে যাচ্ছিল নীল জামা আর আমি লড়াই করে জিতলাম নীল জামার হয়ে? চোরের মতো এক পা এক পা করে পিছিয়ে এলাম আমি। ভিড় থেকে বেরুলাম। কেউ আমাকে লক্ষ করল না?

গল্পে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজধানীর বুকে নারীর সম্ভ্রমহানীর চেষ্টা যা তরুণ সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র।'বস্তুত, নাগরিক জীবনে মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতা এবং তাদের অসহায়ত্বকে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক, গল্পটি বাস্তবতার অপূর্ব উপস্থাপন।'[২০] মূলত বিভাগোত্তর হঠাৎ বিত্ত-বৈভবের অধিকারী পরিবারের সন্তান ভোগবাদী মানসিকতাপ্রবণ হয়ে ওঠে, গল্পে তারই ছবি ফুটে উঠেছে।

সৈয়দ শামসুল হকের নাগরিক জীবনবাস্তবতায় পুরুষের দেহগত লালসার আরেক গল্প 'যদি জানতে চান।' গল্পে শহুরে জীবনে মদ, নারী আর জুয়ার প্রসঙ্গ এসেছে। সাদা দোতলা বাড়ির নিচতলায় বসবাসকারী ছোট বউ রূপসী, তার রূপের নেশায় অনেকে পাগল প্রায়। জুয়াড়ি স্বামী তার তিন ভরির সোনার হার জুয়া খেলে হেরে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। সেই হারটা তার এতই প্রিয় যে, সেটা উদ্ধারের জন্য ঐ নারী ছুটে যায় দাগী আসামী এলাকার সন্ত্রাসী লোকটির কাছে। বিকারগ্রস্ত লোকটি অন্ধকার জগতের বাসিন্দা, এমন কোন খারাপ কাজ নেই যা সে করে না। সে নিজেই বলেছে, 'আমি গুন্ডা, তাস খেলি, পকেট কাটি, চাকু চালাই, নেশা করি।' অপূর্ব সুন্দরী ছোট বউকে দেখে লালসা জাগে। নারীলিপ্সু ব্যক্তি খারাপ উদ্দেশ্যে ছোট বউকে হারের অনুসন্ধানে গোপন আস্তানা জজের মার ছাপড়া বাড়িতে নিয়ে যায়। তাকে সেখানে কুমতলবে আটকে রাখে। সরল মনে ঐ নারী তার সঙ্গে যায় কিন্তু তার অসৎ বাসনা সে বুঝতে পারেনি। নারীর প্রতি লালসা থেকে লোকটি নিজের টাকায় জুয়াড়ীদের সর্দারের কাছ থেকে হারটি ক্রয় করে আনে। তার উদ্দেশ্য ছিল ঐ নারীর সঙ্গলাভ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কিছুই করতে পারেনি। ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকটির মধ্যে ন্যায়বোধ জাগ্রত হলে সরল বিশ্বাসী অলঙ্কার পিপাসু নারীর সম্ভ্রম রক্ষা পায়।

(ছ) গ্রামীণ মধ্যবিত্তের প্রতিবাদী চেতনার গল্প

সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'কবি' গল্পের কাহিনি গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। এ গল্পের কথকও একজন লেখক। তিনি তাঁর ফুফুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে গ্রামের লোককবি আব্দুর রব মুনশীর সাক্ষাৎ পান। তিনি লোকসংগীত ও কবিতা রচনা করেন। গ্রামাঞ্চলের জনপ্রিয় কবি, তাঁর গানের বই গ্রামের হাটে হাটে বিক্রি করে তাঁর বড় ছেলে কিছু অর্থ উপার্জন করে। কবি জীবিকার তাগিদে ব্যস্ত থাকেন, মাঠে ফসল ফলান, তাঁর আথালে আছে দুটা দুধেল গাভি। কবির কাব্যসাধনার খ্যাতি গ্রামের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই গুণী ব্যক্তির মাধ্যমে গ্রামের ক্ষমতাবান তালুকদার নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে চান : 'মুনশী, গান রচনা করা লাইগবে। শুইনছাও তো, তালুকদার সাহেব ইলেকশানে খাড়াইছেন। তারে পাশ না করালি দ্যাশের আর মঙ্গল নাই। বুঝছ?' গ্রামের ক্ষমতাবানরা কবিকে তাদের প্রচার প্রচারণার কাজে নিযুক্ত করতে চান। কবি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন : 'আমার সময় নাই।' কবি বজ্রকণ্ঠে আরও বললেন, 'আমি গান রচনা করিতে পারমু না।' মূলত কবির কবিতা ও গানের মাধ্যমে হাটে বাজারে গুণকীর্তন করতে নির্দেশ

দেন তালুকদার। কিন্তু মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন, আত্মসম্মানী কবি সত্য ও ন্যায়ের সাধক। তিনি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য মিথ্যা স্তুতিবাক্য লিখতে রাজি হননি। কবি তালুকদারের ক্ষমতা ও অর্থের কাছে নিজের প্রতিভাকে বিক্রি করেননি। তিনি স্পষ্টভাষায় জনপ্রতিনিধির যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন : 'যে ব্যাডা মানুষ না, যার হাত দিয়া গরিবের একডা কাম হয় নাই, যার প্যাডে এক মুখে আরেক কথা আমি গান রচনা করুম তারে নিয়া? আপনে কন কি, খাঁ সাব!' এর ফলশ্রুতিতে তালুকদারের লোকজন নানাভাবে কবির ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চালায়। তার ক্ষেতের ধান গাছ কেটে ফেলা হয়, তার দুটো গাভি মাঠ থেকে নিখোঁজ হয়। গ্রামের হাটে তাঁর বই বিক্রি করা বন্ধ হয়ে যায়, কবির সমস্ত বই কেড়ে খালের পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কবিকে সতর্ক করা হয় যদি ভবিষ্যতে গান বা কবিতা লেখেন তাহলে এই গ্রাম থেকে তাঁকে উচ্ছেদ করা হবে। ইলেকশনে তালুকদার জয়লাভের পর মুনশীর লেখা গান ও কবিতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কবিকে অবজ্ঞা ও অপমান করা হয়। এখানেই শেষ নয়, জনপ্রতিনিধি হয়েও প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে ওঠে তালুকদার চরম অমানবিকতা ও রুচিহীনতার পরিচয় দিয়েছে:

> তালুকদার সাহেব ইলেকশানে জেতার পর কোথা থেকে দুই ছোকরা গায়েন এনে আবদুর রব মুনশীর বার-বাড়িতে লেঠেল দাঁড় করিয়ে গান করিয়েছেন সারারাত। সে গানের বিষয় ছিল মুনশী সাহেবের ঊর্ধ্বতন আর অধস্তন চৌদ্দপুরুষের আদ্যন্ত শ্রাদ্ধ। অশ্লীল খেউর এর সঙ্গে তুমুল রবে সারারাত বেজেছে ঢোল কাঁসর। কোমর দুলিয়ে চিল চীৎকার করে তারা সারারাত গান করে গেছে।

'নির্বাচনে বিজয়ী তালুকদার সাহেব বস্তুত শোষণ শক্তি বৈষম্যপীড়িত বাংলাদেশের ক্ষমতা পুষ্ট রাজনৈতিক ভুঁইফোড় টাউট শ্রেণীর প্রতিনিধি।'[২১] অসহায় কবি সকলের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। সকলে জানে তিনি কবিতা ও গান কিছুই রচনা করেন না। কিন্তু সারাদিন মাঠে ময়দানে কাজ শেষে রাতের অন্ধকারে গোপনে গোপনে তিনি তাঁর কাব্যচর্চা চালিয়ে গেছেন। কবি অপশক্তির কাছে মাথা নত করেননি। কথকের কাছে এভাবেই মনের কথা ব্যক্ত করেন:

> তালুকদার সাহেব আমার ক্ষতি করতে পারে নাই। এখন কইতে আর ভয় নাই আমার, আমি রচনা থামাই নাই। কথা না কইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে? আমি কত কবিতা গান রচনা করছি তারপরে। সব ল্যাখা আছে। লেইখা তোরঙ্গে বন্ধকইরা থুইছি।

কবি অন্তিমে শয়ানে তাঁর সমস্ত লেখনী যা তোরঙ্গে সংরক্ষিত ছিল, তা লেখকের কাছে তুলে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর কাব্যসংগ্রহ ছাপা হয়েছে , কিন্তু আক্ষেপের বিষয় কবি নিজের সৃষ্টি পুস্তকাকারে দেখে যেতে পারলেন না। গল্পে সৃষ্টিশীল মধ্যবিত্ত কবি অন্তর্মুখী চরিত্র। তাঁকে বঞ্চনাকারী তালুকদার ও তার সঙ্গীরা সমাজের অবক্ষয়িত শ্রেণির প্রতিনিধি। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> ক্ষমতালোভী পেশীনির্ভর রাজনৈতিক সুবিধাবাদের কাছে সৃষ্টিশীল স্বাতন্ত্র্যকামী ব্যক্তি প্রতিভার করুণ অসহায়ত্ব ও চূড়ান্ত পরাভব এ গল্পে বিশ্বস্ত রূপ লাভ করেছে। তালুকদার সাহেবের আচরণ ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এদেশের ক্ষয়িষ্ণু আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতারও অকৃত্রিম উন্মোচন লক্ষ করা যায়।[২২]

গল্পে একজন গ্রামীণ কবির প্রতিবাদী ভূমিকা মানবিকচেতনা প্রসূত। তিনি কোন অন্যায়ের কাছে হার মানেননি। সমকালীন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রেরণজাত গল্পটি প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের মূল্যায়ন এখানে স্মরণীয়:

> কবির এইঅনমনীয় দৃঢ়তার সামনে পরাজিত হয় আধিপত্যশীল মানুষের দাপট। ... কবিতার খাতা ভাসিয়ে দেয়া হয় খালের পানিতে। তার পরেও নতি স্বীকার করেন না কবি। এই গল্পের মধ্যে আছে প্রতিরোধের সাহিত্যের চরিত্র। সময়কেও প্রতিফলিত করে। সামরিক শাসনের জাঁতাকলের নিচে বাস করেও মানুষ তার মর্যাদার জায়গাটা হারায় না – গল্পের এই বোধ পাঠক-হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। মানুষ নিজেরা ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেরণার জায়গা খুঁজে পায়।[২৩]

সৈয়দ হকের ষাটের দশকের গল্পে গ্রাম থেকে শহরে আসা মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংগ্রাম, তাদের বিচিত্র রকমের চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব, ব্যক্তির একাকিত্ব, তার সংকট, মনোগহনের ঘটনাবলি গল্পে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।মধ্যবিত্তের স্বরূপ আনুসন্ধানে লেখক উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সমসাময়িক আরও যে সকল লেখকের গল্পে নগরজীবন ও মধ্যবিত্তের সমস্যা, সংকট স্থান পেয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন– আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩১–), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২–১৯৮৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২–২০০৯), বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬–) প্রমুখ। এ দশকের গল্পের মূল প্রবণতা প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> ষাটের দশকের গল্পে নগরজীবন ও শহুরে মানুষের জীবনযাত্রা, জীবনের জটিলতা অধিকমাত্রায় চিত্রিত। সময় ও সমাজের ক্রমপরিবর্তনশীলতা ধারণে এ পর্বের গল্পকারগণ সবসময়ই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা গল্পের বিষয় হিসেবে নাগরিক জীবনযাত্রার অন্তঃসারশূন্যতা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, নাগরিক মধ্যবিত্তের অসঙ্গতি, অবনতি, নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, বিকৃতি প্রভৃতিকে অবলম্বন করেছেন।[২৪]

উপসংহার

'ভাষা আন্দোলনের চেতনা সমৃদ্ধ পঞ্চাশের দশক যখন উজ্জীবিত-উচ্চকিত ; সামরিক শাসন-অবরুদ্ধ ষাটের দশক অন্তর্মুখী ও দ্বিধান্বিত ব্যক্তিগত জগতে'[২৫]– এই সময়কে সৈয়দ হক তাঁর গল্পে ধারণ করে সমকাল সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। কালের অগ্রযাত্রায় মধ্যবিত্ত হয়ে উঠেছে তাঁর গল্প ও উপন্যাসের নায়ক। তিনি গল্পে মধ্যবিত্তের সামগ্রিক জীবনসত্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এদেশের সমাজ বিকাশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর এ পর্যায়ের গল্পে নগরজীবনে চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের সংখ্যাই বেশি, ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম। তবে চাকুরিজীবী মধ্যমশ্রেণির দুর্দশাই বেশি বর্ণিত হয়েছে। তাদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, আর্থিক-অনটন, নৈতিক অবক্ষয়, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অঙ্কনে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। এছাড়া তিনি নগরমানসের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যে নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, বিকার ও অসারতাও ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পে উপস্থাপিত মধ্যবিত্তের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম ; তারা তাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে জীবনযাপনের চেষ্টা করে। তাঁর নগরচেতনায় নেই বস্তিবাসী –কুলি, মজুর, রিকশাচালকসহ নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া মানুষ। সৈয়দ হকের নগরজীবনে পাওয়া গেছে মাতাল, মদ, নারী ও জুয়াড়ি প্রভৃতি অনুষঙ্গ। তাঁর নির্মিত মধ্যবিত্ত চরিত্র জীবন সংগ্রামে অগ্রবর্তী। নব উত্থিত মধ্যশ্রেণি অধিকারসচেতন ও প্রতিবাদী চেতনায় উজ্জীবিত, স্বভাববৈশিষ্ট্যে তারা দ্রোহী। তাঁর 'রাত্রি' ও 'সম্রাট' গল্পে সমকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের রাজনীতি সম্পৃক্ততার ছবি ফুটে উঠেছে। এছাড়া 'সম্রাট' গল্পে মিছিলে প্রকম্পিত ঢাকা নগরীর চিত্রও পাওয়া যায়। মূলত মধ্যবিত্ত সমাজই এদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে এসেছে অধিকার আদায় ও স্বদেশমুক্তির বারতা। তাঁর গল্পে সামষ্টিক মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও ব্যর্থতা চিহ্নিত হয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ* (কলকাতাঃ রত্না প্রকাশন, ১৯৭৪), পৃ. ৬১

২. আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা:নওরোজ কিতাবিস্তান,১৯৬৯) ,পৃ. ৩৩৩

৩. মো. সানোয়ার হোসেন, 'সৈয়দ শামসুল হকের রক্তগোলাপঃ একটি পর্যালোচনা', *জলেশ্বরীর জাদুকর*, শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত (ঢাকাঃ কথাপ্রকাশ, ২০১৫), পৃ. ২৮২

৪. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত/সরদার ফজলুল করিম, *চল্লিশের দশকের ঢাকা* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ. ৬০

৫. রফিকুল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ২৩

৬. মো. মুস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৯), পৃ. ৪৮

৭. সৈয়দ শামসুল হক, 'রাত্রি' ,*গল্পসমগ্র* (ঢাকাঃ অনন্যা প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ.৩৯
[আলোচ্য প্রবন্ধে গল্পের মূলপাঠ উক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।]

৮. চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৯), পৃ.১১৮

৯. রফিকউল্লাহ খান,পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

১০. মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ৪০২

১১. রফিকউল্লাহ খান,পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

১২. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ২৪৪

১৩. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

১৪. তদেব

১৫. মো. মুস্তাফিজুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য* (ঢাকা : আজকাল প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১৭৪

১৭. মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

১৮. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

১৯. মোস্তফা তারিকুল আহসান ,পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৫

২০. তদেব

২১. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

২২ . তদেব

২৩. সেলিনা হোসেন, 'কথাশিল্পী সৈয়দ শামসুল হক' ,*জলেশ্বরীর জাদুকর*,পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯

২৪. সরিফা সালোয়া ডিনা, *হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প* : বিষয় ও প্রকরণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১০), পৃ. ৩৫

২৫. সিরাজুল ইসলাম,'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের ছোটগল্প', *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য (১৯৭২- ৯৭)*, সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ৯২